ATHENA, VOLUME IV, JULY 2020 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 95-102
www.athenajournalcbm.in

শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদ: জন্ম সার্ধশতবর্ষের প্রাক্কালে অনন্যতার অন্বেষা

স্বরাজ বক্সী*

প্রাপ্ত: ১০/০৫/২০২০ পরিমার্জন: ৩০/০৬/২০২০ গৃহীত: ২২/০৭/২০২০

সারসংক্ষেপ: *অরবিন্দ ঘোষ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এক নতুন ধারার স্রষ্টা। আধুনিক চিন্তা ও দর্শনের ক্ষেত্রে তিনি সমগ্র বিশ্বময় এক নতুন ধারার সূচনা করেছিলেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অরবিন্দ ছিলেন দেশপ্রেমিক, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী, প্রথাগত জ্ঞানের বিকল্প চিন্তক, মানবতার ঐক্যে আস্থাশীল দার্শনিক এবং বিশ্বমানবে মেলবন্ধনকারী উচ্চমার্গের সাধক। তাঁর চিন্তাধারার এই অনন্যতা জাতীয়তাবাদের ধারণাকেও এক নব আধ্যাত্মবাদের আঙিনায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। সংগত কারণেই জাতীয়তাবাদের ধারণাকে তিনি প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে, একটা জাতি তখনই বাস্তব রূপ ধারণ করে যখন তার মধ্যে জাতীয় আত্মা জাগ্রত হয়। অরবিন্দের জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রদর্শন ছিল আন্তর্জাতিক চেতনাসম্পন্ন। তিনি সকলের চাহিদা পূরণ, সাম্য ও সমতার মধ্যে দিয়ে যে জাতীয়তাবাদের আদর্শ গড়ে তুলেছেন তা শুধু ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর সকল দেশের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। অরবিন্দের আধ্যাত্মমুখী, মানবকল্যাণকারী, সমাজ সচেতন, সাম্যবাদী মানবিক ঐক্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ জাতীয়তাবাদের ধারণা চূড়ান্ত পরিণামে সকল জাতির ক্ষুদ্র গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বমানবতার চেতনায় পরিণত হয়েছে। অরবিন্দ কঠোর নির্জন যোগসাধনার পর ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে আধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন এবং এই সময় থেকেই তিনি 'শ্রী অরবিন্দ' নামে পরিচিতি লাভ করেন। তবে নির্জন যোগসাধনার মধ্যে নিমগ্ন থাকলেও স্বদেশের এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর তিনি খবর রাখতেন। সুতরাং, শ্রীঅরবিন্দের চরিত্র শুধুমাত্র ঘটনার ঘনঘটা নয়, তত্ত্ব-এষণা ও দার্শনিক জিজ্ঞাসার দিক থেকেও খুব জটিল। তাছাড়া বাহ্যিক জীবন চাক্ষুষ করে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের অনুসন্ধান করাও সম্ভব নয়। কাজেই তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করেছেন এমন ব্যক্তিরই এই কাজে অগ্রাধিকার থাকা প্রয়োজন। বর্তমান প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে আলোচনার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করেছি মাত্র, যা একপ্রকার স্পর্ধা প্রদর্শনের সামিল।*

সূচক শব্দ: *জাতি (Nation), সনাতন ধর্ম, আধ্যাত্মবাদ, বন্ধনমুক্তি, জাতীয়তাবাদ।*

---

* স্টেট এডেড কলেজ টিচার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, চাপড়া বাঙ্গালঝি মহাবিদ্যালয়, নদীয়া।
e-mail: swarajbakshi5@gmail.com

ভূমিকা

কাকতালীয়ভাবে হলেও ভারতের স্বাধীনতা লাভ এবং শ্রীঅরবিন্দের জন্মগ্রহণের দিনটি একই ছিল। অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট। আপাতভাবে এই সাদৃশ্যের মধ্যে কোন তাৎপর্য না থাকলেও, আধ্যাত্মিক তথা দার্শনিক প্রেক্ষাপটে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। জীবন সায়াহ্নে এসে তিনি ভারতের স্বাধীনতালাভ চাক্ষুষ করেছিলেন। যে স্বাধীনতা এসেছিল ভারত মাতাকে দুই ভাগে ভাগ করে। শ্রীঅরবিন্দ রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে খুব বড় করে দেখেননি। তবে রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মনে করতেন এবং সেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভারতীয়রা অল্পকালের মধ্যেই লাভ করবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। বরং তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন মানুষের আত্মার উন্নতি বা বন্ধনমুক্তির উপরে। তিনি স্বাধীনতার আধ্যাত্মিক ধারা প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই প্রকৃত জাতি (Nation) হিসেবে ভারতবর্ষকে গঠন করতে চেয়েছিলেন। বর্তমান সময়ে জাতীয়তাবাদকে যান্ত্রিক, অর্থনৈতিক এবং প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অরবিন্দ জাতীয়তাবাদকে গড়ে তুলেছিলেন পবিত্র দেশানুরাগ ও আধ্যাত্মিক ঐক্যের আবেগ সঞ্চারিত করে। তিনি মনে করতেন সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব হবে মানব প্রকৃতির আধ্যাত্মিক রূপায়নের মধ্যে দিয়ে সার্বজনীন ঐক্যের পথ ধরে। জাতিকে (Nation) উৎকৃষ্টতার চরমতায় প্রতিষ্ঠা করতে তিনি গণতান্ত্রিক সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা আধ্যাত্মিক প্রেরণায় স্নাত। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল শুধুমাত্র জৈব অস্তিত্ব মানুষের জীবনের একমাত্র পথ হতে পারে না, তাকে আয়ত্তে এনে অতিক্রম করা এবং উন্নততর অতিমানবের পর্যায়ে উন্নীত হলে তবেই মানব জীবনের প্রকৃত সার্থকতা। আর এই দর্শনকে পাথেয় করেই তিনি বৈদান্তিক ভাববাদের সঙ্গে পাশ্চাত্য রাষ্ট্র দর্শনকে একই সূত্রে বাঁধতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইতিহাস, সমাজ, দর্শন, রাজনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্পর্শ স্থাপন করেছিলেন তিনি। শৈশবে তাঁর পিতা ভাবনা-চিন্তা করে নামকরণ করেছিলেন অরবিন্দ, অর্থাৎ পদ্ম বা কমল। আর পরবর্তী জীবনে তিনি মানবিকতাবোধের অসামান্য নিদর্শন স্থাপনের মধ্যে দিয়ে তাঁর নামকরণের সার্থকতাকে তিনি নিজেই প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন।

বিলাতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সান্নিধ্য লাভ

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট এক বিশিষ্ট হিন্দু বাঙালি পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার ইচ্ছাতেই মাত্র সাত বছর বয়সে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁকে বিলাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর অর্থাৎ একুশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি বিলাতে জীবন অতিবাহিত করেন। এই সময় কালে তিনি বিভিন্ন ইউরোপীয় ক্লাসিক গ্রন্থসমূহের মৌলিক রচনা সমূহ অধ্যয়ন করেন। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গ্রীক এবং লাতিন ক্লাসিক সাহিত্য সমূহ। বিলেতে থাকার সময় থেকেই তিনি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। এই সময়কালে তিনি বিপ্লবী চার্লস স্টুয়ার্ট পারনেলের আদর্শের অনুগামী হন। আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতার দাবিতে সংগঠিত 'সিন ফিন' আন্দোলনের প্রতি যুবক অরবিন্দের আগ্রহ ছিল অপার। সেই সময়ে লন্ডনে প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে সংগঠিত 'Lotus and Dagger' নামে একটি বিপ্লবী সংস্থা ছিল। এই সংস্থায় তিনি যুক্ত হন এবং বিপ্লবী আদর্শ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় দাদাভাই নৌরজির বিলেতে পার্লামেন্টের নির্বাচনী দ্বন্দ্বের বিষয়টি অরবিন্দকে বিশেষভাবে উজ্জীবিত করে।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এবং জাতীয়তাবোধের সূচনা

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ বিলেতের প্রবাসী জীবন থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বড়দায় প্রথমে প্রশাসনিক কাজে এবং পরে বড়দা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। এই সময় থেকেই অরবিন্দের জীবনে জাতীয়তাবোধের সূচনাকাল হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। কলকাতায় তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যোগদেন এবং এই সময় থেকেই

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্পষ্টতর হতে থাকে। স্বজাত্যবোধ সম্পর্কে তাঁর ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, যখন তিনি বড়দায় সরকারি চাকরীতে যোগদেন তখন থেকেই। এই সময়কালে তিনি ভারত ও বাংলা ভাষা চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাংলা ভাষায় বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। বাংলা পত্র-পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'ধর্ম' পত্রিকা। এর সঙ্গেই তিনি প্রকাশ্য রাজনৈতিক কাজ শুরু করেন তাঁর কেমব্রিজ বন্ধু কে. জি. দেশপান্ডের 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় *'New Lamps for the Old'* নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধের মাধ্যমে। উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে যখন বাঙালিরা বাংলা ভাষা, সংস্কৃতিকে পরিত্যাগ করে ইংরেজি ভাষা ও আদব - কায়দা রপ্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছিল তখন অরবিন্দ বাংলা ভাষায় নিজেকে দক্ষ করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিলেতে থাকার ফলে বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল। জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার পর এই অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করার জন্য তিনি বাংলা ভাষা চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। বাংলা ভাষা চর্চার প্রতি অরবিন্দের এই আগ্রহের আরেকটি অন্যতম কারণ ছিল ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা আপামর বাঙালির কাছে তুলে ধরা। 'ধর্ম' পত্রিকায় যে সকল বাংলা প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন তার লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মভাব জাগিয়ে তোলা এবং তিনি মনে করতেন যে ধর্মভাব ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বাঙালি মনে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটালে জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটবে।[১] তিনি এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে জাতীয়তাবাদের ধারণাটি পাশ্চাত্য দেশ থেকে এসেছে। কিন্তু তাই বলে একে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। তবে পাশ্চাত্যের এই জড়বাদী জাতীয়তাবাদ ভারতীয় সভ্যতার পক্ষে অনুকরণ করা সম্ভব নয়। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জাতীয়তাবোধের উন্মেষ অবশ্যই প্রয়োজন। অতএব, সেই জাতীয়তাবাদ অবশ্যই ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিকে সঙ্গে নিয়ে গড়ে উঠবে, ভারতবাসীর মধ্যে জাগিয়ে তুলবে ধর্মীয় চেতনা। আর এর জন্য প্রয়োজন এমন একটা ভাষা, যে ভাষা সকলে বোঝে এবং যে ভাষার মধ্যে দিয়ে ভাব বিনিময় সম্ভব হয়। স্বাধীনতার অর্থ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন: "স্বাধীনতা আমাদের রাজনীতিক চেষ্টার উদ্দেশ্য, কিন্তু স্বাধীনতা কি, তাহা লইয়া মতভেদ বর্তমান। অনেকে স্বায়ত্তশাসন বলেন, অনেকে উপনিবেশিক স্বরাজ বলেন, অনেকে সম্পূর্ণ স্বরাজ বলেন। আর্য্য ঋষিগণ সম্পূর্ণ ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা এবং তৎফলস্বরূপ অক্ষুন্ন আনন্দকে স্বরাজ্য বলিতেন। রাজনীতিক স্বাধীনতা স্বরাজ্যের একমাত্র অঙ্গ- তাহার দুইদিক আছে, বাহ্যিক স্বাধীনতা ও আন্তরিক স্বাধীনতা। বিদেশীর শাসন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি বাহ্যিক স্বাধীনতা, প্রজাতন্ত্র আন্তরিক স্বাধীনতার চরম বিকাশ। যতদিন প্রজাতন্ত্র সংস্থাপন না হয়, ততদিন জাতির অন্তর্গত প্রজাকে স্বাধীন মনুষ্য বলে না। আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। বিদেশীর আদেশ ও বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি, স্বগৃহে প্রজার সম্পূর্ণ আধিপত্য, ইহাই আমাদের রাজনীতিক লক্ষ্য।"[২]

প্রত্যক্ষ জাতীয়তাবাদ থেকে আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদে পদার্পণ

একথা সত্য যে অরবিন্দের জীবনের অর্ধেকের অধিককাল অতিবাহিত হয়েছে মানবিক চিন্তা ও আধ্যাত্মবাদ চর্চার মধ্যে দিয়ে। এতদসত্ত্বেও তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ বাস্তবতা নিরপেক্ষ ছিল না। রাষ্ট্র সম্পর্কে তিনি স্বচ্ছ ও বাস্তব ধারণা পোষণ করতেন। সমকালীন রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে তিনি গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেছিলেন। ব্রিটিশ শক্তির ঔপনিবেশিক শাসন - শোষণ থেকে মুক্তির সংগ্রামে তিনি সামিল হয়েছিলেন। জীবনের প্রথমার্ধে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কান্ডারী হিসেবে অরবিন্দের ভূমিকা শ্রদ্ধার আসনে আসীন। ভারতমাতার মুক্তি সংগ্রামে তিনি সর্বস্ব পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা' শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "ভারতের মুক্তিসাধন শ্রীঅরবিন্দের কাছে ছিল এক জৈব দায়িত্বস্বরূপ। সেই দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তিনি এক উন্নত মানবগোষ্ঠীর কল্পনা করেছিলেন। স্বরাজ বলতে তিনি কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা মনে করতেন না স্বরাজের মধ্যে দিয়ে তিনি ভারতের সনাতন ভাবধারা এবং রাজনীতিতে বৈদান্তিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন। তাঁর মতে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কেবল দেশপ্রেমের

দ্বারাই সম্ভব নয়; তদুপরি চাই আত্মদান। স্বরাজ সাধনার অঙ্গস্বরূপ তিনি আত্মোন্নতি ও আত্মরক্ষার সাহায্যে ভারতের সনাতন অন্তরাত্মার পুনরুজ্জীবন কামনা করতেন।"[৩] প্রচলিত অর্থে জাতীয়তাবাদ বলতে আমরা যা বুঝি, শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়তাবাদের সেই বস্তুগত ধারণাকে পোষণ করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন একটা জাতির (Nation) মধ্যে যখন জাতীয় আত্মা জাগ্রত হয় তখনই সেই জাতি জাতীয়তাবাদের রূপ পরিগ্রহ করে। মানুষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের একটি পর্যায় হল এই জাতীয়তা। তাই দেশাত্মবোধ সম্পর্কে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার উপর বিশ্বাস করতেন। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন: "দেশ জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা, জাতি নহে, ধর্ম্ম নহে, আর- কিছুই নহে, কেবল দেশ। আর- সকল জাতীয়তার উপকরণ গৌণ ও উপকারী, দেশই মুখ্য ও আবশ্যক। অনেক পরস্পর বিরোধী জাতি এক দেশে নিবাস করে, কখনও সদ্ভাব, একতা, মৈত্রী ছিল না, কিন্তু তাহাতে ভয় কি? যখন এক দেশ, এক মা - একদিন একতা হইবেই হইবে, অনেক জাতির মিলনে এক বলবান অজেয় জাতিই হইবে।"[৪] শ্রীঅরবিন্দের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার অন্যতম প্রধান অঙ্গ হল জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর এই ধারণা। সমগ্র ভারতবর্ষকে তিনি একটা জাতি (Nation) হিসেবে কল্পনা করেছিলেন এবং এই ধারণার উদ্ভব ঘটেছিল তাঁর জাতীয়তাবাদ ও জাতি-আত্মার ধারণা থেকে। পন্ডিচেরিতে বসবাসকালে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ *'The Human Cycle'* ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি জাতীয়তাবাদের জীবন্ত শক্তির সন্ধানলাভ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ *'The Life Divine'* ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আধ্যাত্মবাদের উপর শ্রীঅরবিন্দের একটি অপূর্ব কাজ হল *'Savitri'*, এটি প্রকাশিত হয় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে। এই মহাকাব্যটি সাবিত্রীর উপাখ্যান আশ্রয় করে রচিত এবং এটাকে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য বলা চলে।

জাতীয়তাবাদের উৎস সন্ধানে

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে শ্রীআরবিন্দ মূল শিকড় খুঁজে পেয়েছিলেন প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রের ধারণার মধ্যে, মঙ্গোলিয়ার রাজতন্ত্রের মধ্যে, প্রাচীন ইউরোপে কেল্টিক জাতির মধ্যে এবং প্রাচীন আর্যদের কুল বা জাতি ধারণার মধ্যে।[৫] তিনি ইংল্যান্ড, স্পেন, রাশিয়া, তুর্কি প্রভৃতি দেশের ইতিহাস এবং রোমান, গথ প্রভৃতি জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, জাতি রাষ্ট্রের ধারণাটির মূলে ছিল আধিপত্যের ধারণা এবং সর্বময় কর্তৃত্বের ধারণা। ভারতবর্ষের মধ্যেও তৎকালীন দুর্দশা তাঁকে ব্যথিত করেছিল। এই ভারতবর্ষীয় দুর্দশা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তিনি সদা সচেষ্ট ছিলেন। এই দুর্দশা মোচন করতে হলে একদিকে যেমন প্রয়োজন ভারতীয় কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ তেমনি ভারতীয়দের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সকল অভাব রয়েছে তা মোচনের জন্য পাশ্চাত্য দেশ থেকে অত্যন্ত বিবেচনার সঙ্গে সুবিধা গ্রহণ করার পরামর্শ তিনি দিয়েছেন। কোন প্রকার গোঁড়ামি ছাড়াই এই সুবিধা গ্রহণ করা উচিত বলে তিনি মনে করতেন। অর্থাৎ প্রকৃত জাতীয়তাবোধকে উজ্জীবিত করতে হলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মিলন আবশ্যক। আর এই মিলনের মধ্যে দিয়েই প্রকৃত জাতীয়তাবাদের হাত ধরে ভারতবর্ষের সার্বিক মুক্তি ঘটবে। তবে তিনি বারবার সাবধান করে বলেছেন পাশ্চাত্য দেশ থেকে কিছু গ্রহণ করার সময় আমাদের অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং শুধুমাত্র সেই জিনিস গুলিই আমরা গ্রহণ করব যা আমাদের উন্নতির কাজে লাগবে। "We are to have what the West can give us, because what the West can give us is just the thing and the only thing that will rescue us from one present appalling condition of intellectual and moral decay, but we are not to take it haphazard and in a lump; rather we shall find it expedient to select the very best that is thought and known in Europe, and to import even that with the changes and reservations which our diverse conditions may be found to dictate." [৬]

আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদের শর্তাদি ভারতবর্ষে বর্তমান

শ্রীঅরবিন্দের কাছে জাতীয়তাবাদ ছিল আবেগপূর্ণ উচ্চাকাঙ্ক্ষা। আর এই ঐশ্বরিক ঐক্যের উপাদান হল ব্যক্তি

মানুষ। তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে মতপার্থক্যকে স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন যে, মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সকলেই সমান এবং সকলের মধ্যে ঐক্যের স্রোত প্রবাহিত। ভারতে যখন প্রকৃত জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হবে তখন কোন প্রকার ভেদাভেদ থাকবে না, জাতপাতের বিচার বিলুপ্ত হবে এবং জাতীয়তাবাদী আদর্শে সকলে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে তুলবে। জাতীয়তাবাদের প্রকৃত লক্ষ্য হবে ভারতবর্ষকে সামাজিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে গড়ে তোলা। ইংরেজ শাসন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যে ভেদাভেদের প্রাচীর তুলেছে সেই প্রাচীর ভেঙে দিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ গড়ে তোলাই হবে জাতীয়তাবাদের মূল লক্ষ্য। তৎকালীন ভারতবর্ষীয় সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মের প্রভাব এত বিস্তৃত ছিল যে ধর্মকে বাদ দিয়ে জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলা একপ্রকার প্রায় অসম্ভব ছিল। তাই শ্রীঅরবিন্দও ধর্মকে পাথেয় করে আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। জাতীয়তাবাদের মতোই শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতিতেও আধ্যাত্মিক রূপায়ণ চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, "প্রাচীন ভারতীয় চিন্তায় বহু নিগূঢ় তত্ত্ব আছে যা এখনও মানুষকে সঠিক পথের নিশানা দিতে পারে। ভারত কোনও দিনই আক্রমণকারী দেশ রূপে গড়ে উঠবে না। সে তার সনাতন জ্ঞানভান্ডার মনুষ্য সমাজের সাম্য, ঐক্য ও সমৃদ্ধির জন্য উন্মুক্ত রাখবে।"[৭] শ্রীঅরবিন্দ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পবিত্র, শক্তিমান ও জাতীয় আত্মসম্মানবোধকে উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, একমাত্র আত্মত্যাগের গুণাবলীই মানুষকে এই ভাবে গড়ে তুলতে পারে। যে ব্যক্তির মধ্যে আত্মত্যাগের বাসনা গড়ে উঠবে তার অন্য কোন দোষ - ত্রুটি থাকলেও সে অতীতের সকল অন্ধকারকে অতিক্রম করে উচ্চতর মানবতার অধিকারী হতে পারবে। তিনি আরও মনে করতেন, যে জাতি আত্মত্যাগের মত কাজ করতে জানে সে জাতি তার ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারে।[৮]

জাতীয়তাবাদ ঈশ্বর কর্তৃক উৎপন্ন ধর্ম

ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ সমূহ যেমন- গীতা, উপনিষদ, বেদ প্রভৃতির মর্মবাণী পুনরুজ্জীবিতকরণের মাধ্যমেই ভারতবাসীর চরিত্রের পুনর্গঠন করা সম্ভব বলে শ্রীঅরবিন্দ মনে করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ এবং মহত্মা গান্ধীর মত শ্রীঅরবিন্দও মনে করতেন জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটবে নবজাগরণ থেকে এবং এই নবজাগরণের রসদ রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র সমূহের মধ্যেই। তবে তিনি ধর্মীয় শাস্ত্র সমূহের মধ্যে কোনরকম সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেননি। তাঁর মতে, "কোন ধর্ম ও যদি সার্বিক না হয়, তা কখনও চিরন্তন হতে পারেনা। একটি সংকীর্ণ ধর্ম, একটি গোঁড়ামিপূর্ণ ধর্ম শুধুমাত্র স্বল্প সময় ও সীমিত উদ্দেশ্যের জন্য বেঁচে থাকতে পারে।"[৯] তাই অরবিন্দ ধর্মকে সর্বাধুনিক অকৃত্রিম এবং দর্শনের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে চেয়ে ছিলেন। যে ধর্ম বিজ্ঞান, বিশ্বাস, আস্তিক্যবাদ, খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম, বৌদ্ধ ধর্ম এবং এসবের কোনটির অন্তর্ভুক্ত না হলেও বিশ্ব আত্মার সঞ্চারণশীলতাকে স্বীকার করে নেয় তাই ধর্ম। এই জন্য ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে শুধুমাত্র সামরিক শক্তি ব্যবহার করে বাহুবলের দ্বারা বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন সামরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির মিলন সেতু রচনা করা। আপাতদৃষ্টিতে অরবিন্দের এই ধর্মাবলম্বী জাতীয়তাবাদী ধারণা থেকে মনে হতেই পারে যে তিনি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের পূজারি ছিলেন। কিন্তু তিনি জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না। তাঁর দর্শন ও চিন্তার মধ্যে বিশাল এক উদারতা ও উন্মুক্ততা বর্তমান ছিল। জাতীয়তাবাদের ধারণার মধ্যে দিয়েই তিনি বিশ্ব মানবতাবাদের জয়গান করেছেন। তাঁর মতে, "বক্তৃতার উত্তেজনা নহে, ম্লেচ্ছদত্ত বিদ্যা নহে, সভা-সমিতির ভাবসঞ্চারিণী শক্তি নহে, সংবাদপত্রের ক্ষণস্থায়ী প্রেরণা নহে, নিজের মধ্যে আত্মার বিশাল নীরবতায় ভগবান ও জীবের সংযোগে যে গভীর অবিচলিত অভ্রান্ত শুদ্ধ সুখদুঃখজয়ী পাপপুণ্যবর্জিত শক্তি সম্ভূত হয়, সেই মহাসৃষ্টিকারিনী, মহাপ্রলয়ঙ্করী, মহাস্থিতিশালিনী, জ্ঞানদায়িনী মহাসরস্বতী, ঐশ্বর্য্যদায়িনী মহালক্ষ্মী, শক্তিদায়িনী মহাকালী, সেই সহস্র তেজের সংযোজনে একীভূত চন্ডী প্রকট হইয়া ভারতের কল্যাণে ও জগতের কল্যাণে কৃতোদ্যম হইবে। ভারতের স্বাধীনতা গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র, মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতের সভ্যতার শক্তিপ্রদর্শন এবং জগৎময় সেই সভ্যতার বিস্তার ও অধিকার। আমরা

যদি পাশ্চাত্য সভ্যতার বলে, সভাসমিতির বলে, বক্তৃতার জোরে, বাহুবলে, স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন আদায় করিতে পারিতাম, সেই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হইত না। ভারতীয় সভ্যতা বলে, আধ্যাত্মিক শক্তিতে, আধ্যাত্মিক শক্তির সৃষ্ট সূক্ষ্ম ও স্থূল উপায়ে স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে।"[১০]

জাতীয় ঐক্যের ধর্মীয় সাধনা

শ্রীঅরবিন্দ ভারতবর্ষের শিল্প, সভ্যতা, সংস্কৃতি কৃষ্টি এবং ধর্মের মধ্যে এক ধরনের ঐক্য লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি 'সনাতন ধর্ম' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। এর মধ্যে দিয়ে তিনি সচেতনভাবেই যুক্তিভিত্তিক চিন্তার বাধা অতিক্রম করে এক আধ্যাত্মিক মর্ম উপলব্ধিকারীর মতোই বলেছেন যে, জাগতিক প্রয়োজনকে অতিক্রম করেই আসল ঐক্য গড়ে উঠতে পারে এবং ঐক্য দেশপ্রেম ও মানবিকতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে সনাতন ধর্ম আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি সকল সমস্যার শিকড় খুঁজতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেন জাতীয়তাবোধের ভিত্তি নিহিত রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক ঐক্যের ওপর। যার ফলে প্রতিটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বৃহৎ মানব সমাজের অংশ বলে গর্ব অনুভব করবে। স্বার্থবোধের মধ্যে সাম্য এবং একই ধরনের আচরণের উদয় হলে জাতীয়তাবোধ শক্তি অর্জন করে এবং একটা জাতির মধ্যে থেকে সকল প্রকার ভীতি দূর হয়। অরবিন্দের কথায়, "আমাদের ধর্ম সনাতন ধর্ম। ...আমাদের উদ্দেশ্য সনাতন ধর্মের প্রচার ও সনাতন ধর্মাশ্রিত জাতিধর্ম ও যুগধর্ম অনুষ্ঠান। আমরা ভারতবাসী, আর্য্যজাতির বংশধর, আর্য্যশিক্ষা ও আর্য্যনীতির অধিকারী। এই আর্য্যভাবই আমাদের কুলধর্ম ও জাতিধর্ম। জ্ঞান, ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম আর্য্যশিক্ষার মূল; জ্ঞান, উদারতা, প্রেম, সাহস, শক্তি, বিনয় আর্য্যচরিত্রের লক্ষণ। মানবজাতিকে জ্ঞান বিতরণ করা, জগতে উন্নত উদার চরিত্রের নিষ্কলঙ্ক আদর্শ দেওয়া, দুর্বলকে রক্ষা করা, প্রবল অত্যাচারীকে শাসন করা আর্য্যজাতির জীবনের উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সাধনে তাহার ধর্মের চরিতার্থতা।"[১১]

জাতীয়তাবাদের আন্তর্জাতিকতাবাদে উত্তরণ

বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ সমগ্র বিশ্বে অভিনন্দিত। শ্রীঅরবিন্দের উদার আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদের ধারণার মধ্যে নিহিত রয়েছে আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ। তিনি সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকেননি, আন্তর্জাতিক মহামিলনের আদর্শে আদর্শায়িত করেছেন জাতীয়তাবাদের ধারণাকে। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শের অনুরাগী। আন্তর্জাতিকতাবাদ সমগ্র মানবজাতির সদিচ্ছার অন্তর্ভুক্ত। জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন জাতি রাষ্ট্রের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য হলেও এই প্রবণতা কখনই আন্তর্জাতিকতাবাদকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। বিশ্বের সকল মানুষ ভেদাভেদ পাশে সরিয়ে রেখে আন্তর্জাতিকতার পক্ষে নিজেদের সামিল করেছে। বিবিধ আদান-প্রদান ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে এই বিশ্ব সহযোগিতার দৃশ্য অরবিন্দের নজরে এসেছিল। বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছিল তাকে তিনি সমর্থন করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের কাছে সমগ্র মানবজাতির এই সদিচ্ছা আন্তর্জাতিকতাবাদের পথকে প্রশস্ত করে। সমগ্র মানবজাতির সার্বিক উন্নতি এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও সংহতির স্বার্থে আন্তর্জাতিকতাবাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

আধ্যাত্মিক আন্তর্জাতিকতাবাদ

শ্রীঅরবিন্দ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জাতীয়তাবাদের ধারণাকে ব্যাক্ত করেছেন। আর এই জন্যই তাঁর জাতীয়তাবাদের আদর্শ শুধুমাত্র ভারত ও ভারতবাসীর মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। সমগ্র মানবজাতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জাতীয়তাবাদের ধারণাটির ওপর আলোকপাত করেছেন। ফলস্বরূপ তাঁর জাতীয়তাবাদ এক বিশ্বজনীন মর্যাদা লাভ

করেছে। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদকে তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদের স্তরে উন্নীত করতে সফল হয়েছিলেন। তাই একটি বিশেষ জাতির (Nation) সার্বিক বিকাশের জন্য যেমন জাতীয়তাবাদের প্রয়োজন, তেমনি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রয়োজন আন্তর্জাতিকতাবাদের। একটি জাতি (Nation) যখন নিজের উন্নতির কথা না ভেবে সকল মানব জাতির উন্নতির কথা ভাবে তখনই জাতি রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিকতাবাদের পথ সুগম হয়। আর এই আন্তর্জাতিকতাবাদের জন্ম হয় জাতীয় চেতনা থেকেই।

মূল্যায়ন

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে শ্রীঅরবিন্দের অবদান অনস্বীকার্য। ভারতের জাতীয়তাবাদকে তিনি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গন্ডি থেকে মুক্ত করে আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন এবং গভীর দেশাত্মবোধের সঞ্চার ঘটিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার কিছু সীমাবদ্ধতা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত তাঁর বক্তব্য অনেকাংশে অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট। দার্শনিক প্রেক্ষাপটে তাঁর জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত ভাবনা-চিন্তার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু এই বক্তব্যের ব্যবহারিক মূল্য নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদী ধারণার পেছনে গভীর আধ্যাত্মিক চেতনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যার ফলস্বরুপ তাঁর এই বক্তব্য অতিমাত্রায় বিমুর্ত এবং সাধারণ মানুষের অধ্যায়নের যোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর আলোচনা আধ্যাত্মিক চেতনার ভাববাদী ধারণায় আবৃত। শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত বক্তব্যে ধর্মীয় সংকীর্ণতাও পরিলক্ষিত হয়। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রাণসঞ্চার করার জন্য তিনি হিন্দু দেবী দুর্গা ও কালীর আরাধনার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষ বহু ধর্ম ও সংস্কৃতির দেশ। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে উজ্জীবিত করার জন্য এইরকম ধর্মীয় সংকীর্ণতা গ্রহণযোগ্য নয়। মার্কসবাদী দার্শনিকদের কথায়, শ্রীঅরবিন্দের অতি আধ্যাত্মিকতা নির্ভর জাতীয়তাবাদের ধারণায় পরস্পরবিরোধী শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রামের অস্তিত্ব স্থান পায়নি। কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাসে শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রামের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

এতদসত্ত্বেও শ্রীঅরবিন্দের কাছে ভারতের মুক্তি সাধন ছিল জৈব দায়িত্বের মত। প্রকৃত মুক্তির জন্য প্রয়োজন ছিল এক উন্নত মানবগোষ্ঠীর। স্বরাজ অর্থে তিনি শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে কল্পনা করেননি। স্বরাজের মধ্যে দিয়ে তিনি ভারতের সনাতন ভাবাদর্শ এবং রাজনীতিতে বৈদান্তিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। স্বরাজ সাধনার জন্য তিনি আত্মোন্নতি ও আত্মরক্ষার সাহায্যে ভারতের সনাতন অন্তরাত্মার প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয় এবং দেশ ভক্তির আদর্শ অগ্রসর হবে ভালোবাসা ও সৌভ্রাতৃত্বের উপর ভিত্তি করে। তিনি আরও বলেছিলেন, শক্তিহীন ভারতীয়রা স্বপ্নরাজ্যে বিরাজ করা মানুষের মত, জাতির হাত থাকলেও তারা ধরতে পারে না, না থাকলেও দৌড়াতে পারে না। সুতরাং, ভারতের প্রধান প্রয়োজন হল শক্তি অর্জন। যে শক্তি ভারতবাসী আজও অর্জন করতে পারেনি। ভারতবাসীর অন্তরের শক্তি প্রকৃত শক্তির উৎস হিসেবে অনুভূত হলে ভারত একদিন নবজন্ম লাভ করবে। পাশ্চাত্য নির্ভর দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ, রাজনীতি থেকে ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। অরবিন্দের মতে, ধর্মের উৎস থেকে শক্তি সঞ্চার করে সমগ্র জাতির উন্নতির জন্য যথার্থভাবে পাশ্চাত্য দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান সমাজে প্রয়োগে সক্ষম হবে। তিনি আধ্যাত্মিক নৈতিকতার সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্বয়ে এক নতুন স্বাধীন ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে তিনি ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের বীজ বপন করে মানবিকতাবোধকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের চিন্তা-চেতনায় ধর্মীয় সহনশীলতা, অসাম্প্রদায়িকতা, স্বজাত্যবোধ, জাতি গঠনের জন্য আত্মত্যাগের আদর্শ অনুসরণ এবং সর্বোপরি জাতীয়তাবোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আধ্যাত্মজীবন নির্ভর শোষণমুক্ত বিশ্বসমাজ গঠনের স্বপ্ন বর্তমান যুগে তাঁর চিন্তাধারাকে বিশ্বব্যাপী বৌদ্ধিক সমাজের কাছে আরও অপরিহার্য করে তুলেছে।

সূত্র নির্দেশ:

১. দাশ, প্রাণগোবিন্দ, (২০০৮), *ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা ও জাতীয় আন্দোলন,* নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, পৃ. ২২৭।

২. *The Complete Works of Sri Aurobindo, Volume- 9, পূর্বোক্ত,* পৃ. ১১৬।

৩. গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন, (১৯৬৮), *বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা - রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ,* সুবর্ণরেখা প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ২৮৮।

৪. Ghosh, Sri Aurobindo, (2017). *The Complete Works of Sri Aurobindo, Volume- 9,* Writings in Bengali and Sanskrit, Sri Aurobindo, বাংলা রচনা, ধর্ম ও জাতীয়তা, দেশ ও জাতীয়তা, Published by Sri Aurobindo Ashram Publication Department, পৃ. ১২৪।

৫. মুখোপাধ্যায়, অশোক কুমার, (২০১৩), (সম্পা.), *ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার পরিচয়,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃ. ৩২০।

৬. Ghosh, Sri Aurobindo, (1974). *New Lamps for Old,* Sri Aurobindo Ashram Pondicherry, pp. 52-53.

৭. দাশ, শ্যামলেশ, (২০০১), *শ্রীঅরবিন্দ ও ভারতের বিপ্লববাদ,* প্রিন্টোবুকস, পৃ. ৯২।

৮. Ghosh, Sri Aurobindo, (1997). "The Doctrine of Sacrifice", Karmayogin: Political Writings and Speeches, 1909, 1910, *The Complete Works of Sri Aurobindo. Volume- 8,* Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, p. 137.

৯. De, Amelendu, (1996). *Relevance of Sri Aurobindo's Thought in Modern Times,* Calcutta: Sri Aurobindo Samiti, pp. 8-9.

১০. *The Complete Works of Sri Aurobindo, Volume- 9, পূর্বোক্ত,* পৃ. ১২৮-১২৯।

১১. *তদেব,* পৃ. ৭৭-৭৮।